ব্রিটিশ জরিপ কার্যক্রম: ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িকতার মূলসূত্র

ড.মো: আসাদুজ্জামান*

Abstract

The political aim of the British colonial government was to continue their rule in India. As a result, they introduced divide and rule policy. They also had several prejudices to govern the then Indian Subcontinent. They believed that the people of this Subcontinent were subsumed only on the basis of religion, specially the monotheistic and polytheistic believers. This prejudice reflects in the population survey that was conducted in India in 1801. This study attempts to analyze how communalism spread in India through the British Survey. The study found that all different types of believers were merged into ideologically two opposite groups. This merging brought two opposite unintended consequences i.e. strong community feelings among different groups and communalism in the Subcontinent.

ভূমিকা

উপনিবেশ স্থাপনকারী ব্রিটিশ শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিলো ভারতীয় সমাজের একতা, কেননা তারা চাইত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা। এটা রক্ষা করতে হলে তাদের প্রয়োজন ছিলো ভারতীয় সমাজের বিভাজন। ১৮৫৯ সালের শুরুতে বোম্বের ব্রিটিশ গভর্নর (লর্ড) এলফিস্টোন লন্ডনে লিখলেন, 'ভাগ কর শাসন কর এ রোমান নীতিটি আমাদের গ্রহণ করা উচিত'।[১] এর কিছু দিন পর জন স্ট্রাচি লিখেন, 'ভারতীয় জনগণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পার্থক্যকে আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত' (Tharoor, 2016)। ব্রিটিশরা ভারতে এ নীতির প্রয়োগ শুরু করে জরিপ কার্যক্রম সূচনার মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই ইউরোপের

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

[১] এটি যদিও রোমানদের ধারণা ছিল না মেসিডোনিয়ার ২য় ফিলিপের ধারণাটি রোমানরা নিজেদের করে নেন।

কয়েকটি দেশে জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। জনসংখ্যা ও তাদের দরিদ্রতা পরিমাপের ভিত্তি কি হবে এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে ১৭৫৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জাতীয় জরিপ বিল পাস হয়। ১৭৯৮ সালে টমাস ম্যালথাসের প্রবন্ধ 'An Essay on Population' প্রকাশিত হওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা সংক্রান্ত বিতর্কটি নতুন করে শুরু হলে ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স ১৮০০ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'ব্রিটিশ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি গণনা' নামে বিলটি পাস করে। যার প্রেক্ষিতে ১৮০১ সালের ১০ই মার্চ থেকে দশ বৎসর পর পর জনসংখ্যা গণনার জরিপ চালু হয়। শুরু থেকেই ব্রিটিশ জনসংখ্যা জরিপে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতে জরিপ এসেছে ভিন্ন রূপে। ভারতে তৎকালে জরিপ কার্যক্রম শুরু হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। উপনিবেশিক শাসকদের লক্ষ্য ছিল উপনিবেশিত অঞ্চলের জমি ও জনসংখ্যা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। ভারতে ১৮৭২ সালে জরিপ শুরু হওয়ার পরপর লর্ড মেয়োর নির্দেশনায় ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টারের সম্পাদনায় ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়ার প্রকাশনা শুরু হয়।[২] ইংল্যান্ড ও ভারতে এর ফল হয় দু'রকম। তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের জন্য ব্রিটেনে জরিপ একটি সেকুলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন এখানে সংযুক্ত করা হয়নি।[৩] পক্ষান্তরে ১৮৭২ সালে ভারতে জরিপ কার্যক্রমের শুরুতেই ধর্ম, জাতিবর্ণ ও নৃগোষ্ঠিগত পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নই ছিল মুখ্য। ধর্মীয় পরিচয়কেই জরিপের প্রধান উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জাতিবর্ণ, নৃগোষ্ঠী, শ্রেণিকরণ ও সাম্প্রদায়িকতা

জরিপ কেবল কোন পরোক্ষ সংখ্যাগত উপাত্ত নয়, এটি বাস্তবতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে ও শ্রেণিকরণ করে। ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলোতে জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয় ও তার ভিত্তিতে প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেন।[৪] তারা ভারতীয়দের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। উপনিবেশিক প্রশাসকরা প্রজাদেরকে আঞ্চলিকতা, ধর্ম, সেক্ট, ভাষা, জাতিবর্ণ, উপবর্ণ, চামড়ার রঙ ইত্যাদিতে বিভাজিত করে রিপোর্ট প্রণয়ন ও জরিপ পরিচালনা করে। এ পার্থক্যগুলোকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। প্রাক-আধুনিক যুগে যেখানে নিজের 'পরিচয়ের' ব্যাপারটি ছিল অনেক হালকা, শুধু আঞ্চলিকতা কিংবা অন্য কিছুকে ভিত্তি করে কোন 'পরিচয়' তৈরি সম্ভব ছিল না। সম্রাট আকবর যেখানে সব ধর্মমতকে একত্রিত করতে আইন-ই-আকবরির মত ধর্মীয় মতাদর্শ চালুর উদ্যোগ নেন, ব্রিটিশরা সেখানে শুরু করেন বিভাজন, পার্থক্য ও শ্রেণিকরণ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজে অসংখ্য সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভাজিত হয়ে বসবাস করে আসছিল। এ বিভাজনের সীমারেখা খুব শিথিল। ব্রিটিশ জরিপকারীরা প্রতিটি বর্ণ ও

---

[২] তুলনাটি স্মরণযোগ্য এ কারণে যে ইংল্যান্ডে জরিপ শুরু হয় পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কিন্তু ভারতে জরিপ ও গেজেট প্রকাশনার কাজ শুরু হয় একটি কর্তৃত্ববাদী উপনিবেশ স্থাপনকারী শাসকদের হাত ধরে।

[৩] ব্রিটেনে ১৯৯১ সালের জরিপে প্রথমবারের মত জাতিগোষ্ঠীর ধারণাটি সংযুক্ত হয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যাপারটি যুক্ত হয় ২০০১ সালে। আমেরিকায় ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্ন জরিপে যুক্ত করার ব্যাপারে এখনও নিষেধাজ্ঞা আছে।

[৪] ফরাসীরা যেমন তাদের উপনিবেশগুলোতে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ শিখিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রিটিশরা উপনিবেশগুলোতে তাদের প্রজাদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। শ্বেতকায় আইরিশদেরও ব্রিটিশ রেস থেকে ভিন্ন করে রাখা হয়, এমনকি তাদের সঙ্গে আন্তঃবিবাহ ও ছিল নিষিদ্ধ। তথাকথিত কালো চামড়ার লোকেদের ব্রিটিশরা অসংখ্য জাতিবর্ণ ও ধর্মে শ্রেণিবিন্যস্ত করেন।

জাতিকে পৃথক মাথা গণনার মাধ্যমে শুমারি চালু করে। ফলে পৃথক জাতি ও বর্ণের পারস্পরিক পার্থক্যগুলো দৃঢ় ও সংবেদনশীল হতে থাকে। এই সম্প্রদায়গুলো জরিপের পূর্বে তাদের সংখ্যাগত শক্তি সম্পর্কে ছিল অসচেতন ফলে আত্মপরিচয়ের আগ্রাসী মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল না, অন্যদের তাদের থেকে পৃথক করার কোন প্রয়োজনও তারা অনুভব করেনি। ব্রিটিশরা ভারতে এসেছে এমন একটি ক্রমোচ্চ সমাজ থেকে যেখানে শ্রেণি হচ্ছে সামাজিক পার্থক্যের মূল একক। ভারতীয় সমাজকেও তারা শ্রেণির ধারণা দিয়ে বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের আদি বৈশিষ্ট্য, জাতিবর্ণের পৃথক গোষ্ঠিগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা তাদের (অ)জ্ঞাতসারে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে 'হিন্দু' পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তে তারা জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণের একক হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু জাতিবর্ণ ব্যবস্থা স্থায়ী কোন একক নয়, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এর রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ড্রিক'স যেমনটি বলেছেন, "উপনিবেশিক শক্তি সমস্ত সামাজিক উপাদানকে পরিমাপ করার জন্য জাতিবর্ণকে ব্যবহার করে"। এক্ষেত্রে ব্যক্তির গ্রাম, সম্প্রদায়, জ্ঞাতি, অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক মতামত ইত্যাদিকে তেমন বিবেচনায় নেয়া হয়নি যার ফলে বর্ণগত পরিচয়ের বিষয়টি প্রধান্য পায়। চর্তুবর্ণের ধারণা দিয়ে পুরো উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থাকে বিন্যস্ত করতে যাওয়া অতি সরলীকরণ ছাড়া কিছু নয় (Throor, 2016)।

সম্প্রদায়গুলোর আত্মপরিচয়ের অস্পষ্ট ধারাটিকে উপনিবেশ স্থাপনকারীরা পরিবর্তন করে দেয় জরিপ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে। সংখ্যা ও সামাজিক বিন্যাসের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সমাজের উপর। বিশেষ করে ধর্মের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ধারণা উনিশ শতকে জনসংখ্যা গণনা তথা জরিপ কার্যক্রমের ফলাফল। সংখ্যা একটি রাজনৈতিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে বিশেষতঃ হিন্দু জনগোষ্ঠী জাতি, বর্ণ, শ্রেণি, সেক্ট নির্বিশেষে সংখ্যাগুরু হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে শুরু করে। মাথাপিছু লোক গণনা প্রচলনের পূর্বে কোন সম্প্রদায় নিজেদের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে অন্য সম্প্রদায়ের সমরূপ বা ভিন্নরূপ ভাবার অবকাশ তৈরি হয় নি। পূর্বে ভারতে 'হিন্দু' বলে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল না। যা ছিলো তা হলো শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব নামক নানা সম্প্রদায়। প্রাক-আধুনিক যুগে 'মুসলিম উম্মাহ'র কোন ধারণাও বিকশিত হয় নি। জরিপ কেবল জনসংখ্যা গণনাই করে না বরঞ্চ তা জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট বাক্সবন্দিও করে দেয় এবং নিজেদের আত্মপরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করে। উপনিবেশিক শাসনের পূর্বে ভারতীয় জনসমাজে সম্প্রদায়গত রেষারেষির নমুনা ছিল খুব বিরল। ব্রিটিশ উপনিবেশকারীরা এ সমস্ত অস্পষ্ট, অদৃঢ় সম্প্রদায়গুলোকে প্রথমে সংখ্যাগত ও পরে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত করে। 'ভাগ কর শাসন কর' এ নীতিটি ১৮২১ সালের শুরুতেই ভারত শাসনের ভিত্তি হিসেবে স্থান পায়; ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সংস্কারের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়। বিশ শতকের সম্প্রদায়গত মানসিকতার পেছনে ১৮৭২ সাল থেকে শুরু হওয়া জরিপ কার্যক্রম তাই অনেকাংশ দায়ি।

জরিপের ফলাফলগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভৌগোলিক পরিচয়কে চিহ্নিত করে। ধর্মের ভিত্তিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িকতার বড় উদাহরণ। আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে জন্ম দেয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো রাজনৈতিক চালের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পৃথক ভোটদানের ব্যবস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা

সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক উত্তেজনার জন্ম দেয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তৎকালীন বড়লাট মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে স্থানীয় পরিষদে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে মুখ্য করে তুলে। এমনকি পাঞ্জাবের লাহোরে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও হিন্দু, মুসলিম ও শিখ আসনের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল যথাক্রমে ৪০:৪০:২০ অনুপাতে। এ সকল বিষয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার দূরত্বকে বাড়িয়ে দিতে থাকে। ফলে একদল অপরদলের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার সম্প্রদায়গত বিভাজন বাড়তে থাকে এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়। অথাৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রদায়গত বিরোধ একটি আধুনিক প্রপঞ্চ, ১৮৮০ সালের পূর্বে যার অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাকরণ ও সাম্প্রদায়িকতা

পরের দিকের জরিপগুলোতে জরিপ কর্মকর্তারা ধর্মের সংজ্ঞার ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণকে শ্রেণিবদ্ধ করার ব্যাপারে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি হন (Bhagat, 2001) । সেন্সাস অফিসাররাও এ ব্যাপারে তাদের সতর্কতা জানিয়েছিলেন যে, জরিপের পরিসংখ্যানিক তথ্যসমূহ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দূরত্ব তৈরিতে সহায়তা করছে।[৫] ১৯১১ সালের সেন্সাস কমিশনারের একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো: 'ভারতে ধর্মীয় পার্থক্যের থেকে সামাজিক পার্থক্যকেই গুরুত্বের সংঙ্গে বিবেচনা করা হয়. এখানকার মানুষ প্রতিবেশীর ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে তার সামাজিক মর্যাদা ও জীবন-যাপন পদ্ধতিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। প্রতিবেশী কি বিশ্বাস করে তার থেকে সে কি খায় কিংবা তার হাতে জল গ্রহণ করবে কিনা সেটাই তার কাছে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।' পাশ্চাত্যেও উপনিবেশকারীদের মানসিকতা ছিল বর্ণবাদী।

প্রতিটি শ্রেণিকরণে জরিপ কর্মকর্তারা বহু ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। প্রদেশগুলোর জরিপ কিংবা সর্বভারতীয় রিপোর্টসমূহে ভারতীয় সমাজের সম্প্রদায়গুলোর আন্তঃমিশ্রণের এমন সব উদাহরণ সন্নিবেশিত থাকত যেগুলোকে জরিপের শ্রেণিকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। যেমন হিন্দুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, "ভারতের অধিবাসী যে কিনা ইউরোপীয়, আর্মেনিয়, মোগল কিংবা পারস্যের কোন বংশধারা থেকে উদ্ভূত হয়নি। যে কিনা একটি নির্দিষ্ট বর্ণের সদস্য, যে ব্রাহ্মণের আধ্যাত্ম শক্তিকে স্বীকার করে নেয়, গোমাংশ ভক্ষণ করে না ও ব্রাহ্মণের নির্দেশনা মান্য করে।" হিন্দু সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করতে তাদেরকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপরীতে সম্পর্কিত করে সংজ্ঞা দেয়া হয়। উত্তরপ্রদেশ, আগ্রা ও অযোধ্যার সেন্সাস সুপারিন্টেডেন্ট জর্জ গ্রিয়ারসন বলেন, 'হিন্দি বলতে যে কোন ভারতীয়কে আর হিন্দু বলতে অমুসলিম ভারতীয়কে বুঝায়।' জরিপ বা সেন্সাসগুলো শুধু 'হিন্দু'দেরকে সংজ্ঞায়িত করেনি এগুলো আসলে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছে 'প্রকৃত হিন্দুকে'। ১৯১১ সালের জরিপে বিভিন্ন প্রদেশের জরিপ তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি নির্দেশ ছিল সে সমস্ত হিন্দু বর্ণ ও উপজাতিগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য যারা ১) ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বকে মানে না ২) ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন

[৫] পাশ্চাত্যেও তাত্ত্বিকদের ধারণা ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম আর পাশ্চাত্যে ধর্মকে সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা হয়েছে। এ কারণেই তারা ভারতের ক্ষেত্রে সেন্সাসে ধর্মীয় পরিচয়কে রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন যদিও প্রাচ্যবাদীরা এ ধরনের ধারণার সমালোচনা করেছেন।

হিন্দু গুরু থেকে মন্ত্র নেয় না ৩) বেদের কতৃত্বকে মানে না ৪) সার্বজনীন হিন্দু দেব-দেবীদের মানে না ৫) পারিবারিকভাবে কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব নেই ৬) কোন ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বে বা নিয়ন্ত্রণে নেই ৭) সাধারণ হিন্দু মন্দিরে যাদের প্রবেশাধিকার নেই ৮) যারা স্পর্শ বা অন্য কোন ভাবে অপবিত্র করতে পারে ৯) যারা মৃতদেহ কবরস্থ করে ১০) গোমাংশ ভক্ষণ করে ও গোবৎসকে যথাযথ সম্মান জানায় না। এ বিশেষণগুলোর প্রয়োগ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম। মধ্য প্রদেশ ও বিহারে বহু হিন্দু ধর্মালম্বী ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না, বেদ মানে না। প্রায় অর্ধেক হিন্দু জনগোষ্ঠী কোন গুরু থেকে মন্ত্র নেয় না বা ব্রাহ্মণের শিষ্য নয়, চার ভাগের এক ভাগ লোক সর্বভারতীয় কোন দেবতার পূজা করে না। তিন ভাগের এক ভাগ জনগোষ্ঠী মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না, এক চতুথাংর্শ লোকের স্পর্শ দ্বারা অন্যেরা অপবিত্র হয় বলে বিবেচনা করা হয়, এক সপ্তমাংশ লোক মৃতদেহ কবরস্থ করে, প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী মৃতদেহ দাহ করাকে অত্যাবশ্যক মনে করে না এবং এক-পঞ্চমাংশ লোক গোমাংশ খায় (J. T. Marten, 1911)। প্রকৃত হিন্দু বলা হয়নি কিংবা এদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে রূপান্তরিত হিন্দু বলে । কিন্তু এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যাদেরকে হিন্দু বলা হচ্ছে তারা সবাই সমরূপ গোষ্ঠী নয় এবং এদের মধ্যে বহু ধরনের ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও আচরণ রয়েছে। এটা সত্য যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। অনেক হিন্দুধর্মাবলম্বী যাদের ধর্ম চর্চার মধ্যে ইসলামী রীতি ও ভাবাদর্শের প্রভাব রয়েছে। যেমন 'ডাফালি ফকিরে'র শিষ্য যারা পাঁচ জন অজানা ইসলামী পীরের উদ্দেশ্যে তাদের গৃহস্থালীর পশু-পাখি বিসর্জন দেয় যেটা 'পঞ্চপ্রিয়' কাল্ট হিসেবে পরিচিত। গুজরাটে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাদের একটি হচ্ছে 'মাটিয়া কুনবিস'— যারা তাদের প্রধান উৎসবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখে কিন্তু তারা ঈমাম শাহ ও তার বংশধরদের অনুসারী এবং তারা মৃতদেহ দাহ না করে কবরস্থ করে। 'শৈখাদাস'রা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু পুরোহিতের পাশে মুসলমাম ঈমাম রাখে, 'মোমনাস'রা খৎনা করায়, মৃতদেহ কবরস্থ করে ও গুজরাটি কোরআন পাঠ করে আবার অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রচলিত আচার-আচরণ পালন করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে জৈন ও শিখদের পার্থক্য খুব আপেক্ষিক। ভারতের কেন্দ্রীয় প্রদেশ ও বিহারের তৎকালীন সেন্সাস কমিশনারও স্বীকার করেছেন, 'বাস্তবে সেন্সাস অফিসাররা ভারতীয় জনগণের জটিল বহুবিধ ধর্মীয় পার্থক্যকে (ইংরেজদের) নিজেদের মত করে শ্রেণিকরণ করেছেন। জরিপকারীরা প্রত্যেককে তাদের প্রথাগত ধর্মীয় পরিচয় (হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রিষ্টান) জিজ্ঞেস করেছে । যারা এই প্রথাগত ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে ছিলনা তাদেরকে বর্ণ বা গোত্র অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। তথ্য সারণিবদ্ধকরণের সময় যদি এরা কোন ধরনের হিন্দু জাতিবর্ণের সংজ্ঞে সম্পৃক্ত থাকত তাহলে তাদের হিন্দু অথবা অন্য কোন শ্রেণিতে অর্ন্তভুক্ত করা হতো' (J. T. Marten, M. A., 1911) ।

এটা স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, উপনিবেশিক জরিপ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হতো উপনিবেশিকদের বর্ণবাদী মানসিকতা দিয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠিগুলোকে সংজ্ঞায়িত করায় ভারতীয় সমাজের গঠন ক্রমশঃ পাল্টে যেতে থাকে। এই সংজ্ঞাকরণগুলো এমনভাবে করা হয় যাতে এদের পারস্পরিক আন্তঃমিশ্রণকে অস্বীকার করা হয়। ফলে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন বাড়তে থাকে। আবশ্যিকভাবে তা 'ভাগ কর শাসন কর' এ নীতির সংজ্ঞে মিলে যাওয়ায় উপনিবেশিক শাসন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ।

তথ্যসূত্র :

Bhagat, R. B. (2001). Census and the Construction of Communalism in India. *Economic and Political Weekly*, *36*(46), 4352–4356.

J. T. Marten, M.A., I. C. . (1911). *Census of India 1911, Part I* (Vol. X). Calcutta: Superintendent Goverment Printing, India.

Tharoor, S. (2016). *An era of darkness: the british empire in India*. New Delhi: Rupa Publications India.